শিশু শিক্ষা নীতি

হজরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)

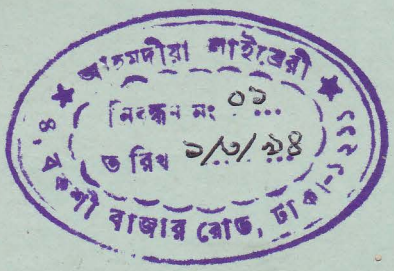

অনুবাদক—নূর আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

শিশু শিক্ষার জন্য ছাব্বিশটি সোনালী মূল নীতি

মানব মনে প্রথমতঃ পাপের যে সূত্রপাত হয় তা মাতা-পিতার সেই চিন্তাধারার ফলশ্রুতি যা শিশুর জন্মের পূর্বে মাতা-পিতার অন্তরে বিরাজমান ছিল। সর্বাগ্রে তার মূলচ্ছেদ করা উচিত। সুতরাং আপন শিশুদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে মানুষ যেন নিজেদের চিন্তাধারা পবিত্র রাখেন। কিন্তু যদি সর্বদা পবিত্রতা অবলম্বন করতে না পারেন তাহলে ইসলাম নির্দেশিত পন্থার অনুসরণ করুন যাতে অন্ততঃ বেশ কিছু সময়ের জন্য সুরক্ষিত থাকে। জন্মসূত্রে উদ্ভূত পাপের প্রবণতা হতে সুরক্ষার জন্য ইসলামে যে প্রতিবন্ধকতার উপায় ব্যক্ত হয়েছে তা হলো—স্বামী-স্ত্রী যখন সহবাসে লিপ্ত হবেন তখন নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবেন—"আল্লাহুম্মা জান্নিবাশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাক্‌তানা"—হে খোদা! আমাকে শয়তান হতে রক্ষা কর, যে শিশু তুমি আমাকে দান করবে তাকেও শয়তান হতে সুরক্ষিত রাখো। এটি কোন যাদুমন্ত্র নয় এবং এমন কোন জরুরী নয় যে, আরবী ভাষাতেই উচ্চারণ করতে হবে বরং আপন আপন ভাষাতেই আপনারা বলতে পারেন। যেমন—হে এলাহী! পাপ খুবই অনিষ্টকর, তাহাতে আমাকে এবং শিশুকেও রক্ষা কর। ফলে সেই সময়ের মন্দ চিন্তাধারা এবং শিশুর মধ্যে একটি পার্থক্যকারী প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই প্রসংগে রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ এই দোয়া করার ফলে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তাতে শয়তানের প্রবৃত্তি থাকে না।

কোন কোন ব্যক্তি হতবুদ্ধি হয়ে বলেন ঃ আমি তো কয়েক-বারই দোয়া পড়েছি কিন্তু দোয়ার জন্য যা বলা হয়েছে সে ফল পাইনি। কিন্তু সেই সন্দেহ নিরশনের উত্তর এই যে, তাঁরা প্রথমতঃ এই দোয়া সঠিকভাবে পড়েন নাই ; কেবলমাত্র মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সর্বপ্রকার পাপের প্রতিকার এই দোয়াতে হয় না, কেবলমাত্র জন্মসূত্রে আগত পাপের জন্য প্রযোজ্য।

জন্মসূত্রে আগত পাপের জের ও তার আদান প্রদান মানুষের চিন্তাধারায় শিশুকাল হতে প্রবাহিত হতে থাকে। ইসলামে এর প্রতিকার স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, শৈশবকালই শিশুদের সুশিক্ষার সময়। রসুল করীম (সাঃ) নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যা শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পালন করা উচিত। আমার মনে হয় যদি সম্ভব হতো তাহলে রসুল করীম (সাঃ) নির্দেশ দিতেন যে, শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন শিক্ষারম্ভ হওয়া উচিত। কিন্তু তা সম্ভব নয়, তাই জন্ম মুহূর্ত হতে শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা এইরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে সেই সময় তার কানে আজান ধ্বনি দেওয়া উচিত। আজানের শব্দগুলি যাদু-মন্ত্রের মত শিশুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করানো হয় না বরং সেই সময় শিশুর কানে আজানের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মাতা-পিতার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হচ্ছে যে, শিশুর শিক্ষার সময় এখন হতেই আরম্ভ হয়ে পড়েছে।

আজান ছাড়াও রসুল করীম (সাঃ) শিশুদের শৈশবকাল হতেই শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করাতে আদেশ দিয়েছেন এবং আপন প্রিয়জনদের শৈশবকাল হতে শিষ্টাচার শিখিয়ে বাস্তবে তা প্রমাণ করে গিয়েছেন। পবিত্র হাদিস হতে জানতে পারা যায়—ইমাম হাসান (রাঃ) যখন অল্প বয়স্ক ছিলেন সেই সময় একদিন আহারের প্রাক্কালে রসুল করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন : কুল্ বেইয়ামিনেকা ওয়া

কুল্ মিম্মা ইয়ালেকা—দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আহার কর এবং তা সম্মুখ ভাগ হতে। হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) এঁর বয়স সে সময় আন্দাজ আড়াই বছরের মত হবে। আমাদের দেশে কোন শিশু যদি সমগ্র খাবারে হাত প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং খাবারে মুখ পরিপূর্ণ করে নেয়, এমন কি আশে পাশে বসে থাকা লোকদেরও কাপড় চোপড় নোংরা করে ফেলে এবং সে সময় তার মাতা-পিতা উপস্থিতও থাকেন তবুও এ বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না। বরং এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করেন। যাতে করে তাঁর শিশুদের সংযত করা নয় বরঞ্চ অন্যদের দেখানোই হচ্ছে ঈপ্সিত কামনা। পবিত্র হাদিসে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ আছে—একবার শৈশবকালে ইমাম হাসান (রাঃ) সাদকার (আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান) খেজুর হতে একটি খেজুর মুখের মধ্যে পুরে ফেলেন তখন রসুলে করীম (সাঃ) তাঁর মুখের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে সেটি বের করলেন—উদ্দেশ্য ছিল যে, নিজেকে পরিশ্রম করে খেতে হবে, অন্যের বোঝাস্বরূপ হওয়া ঠিক নয়।

আসল কথা শৈশবকালই হচ্ছে শিক্ষার উপযুক্ত সময় যা মানুষকে উপযুক্ত করে তুলে তার পরবর্তী জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে। তাই রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ ইমামিম্ মাওলু'দিন ইল্লা ইয়োলাদু আলাল্ ফিতরাতে ফা আবা ওয়া হু ইয়ো হাও বেদানেহি আও ইয়োনাস্ সেরানেহি আওইয়ো মাজ্ জেসানেহি''—বুখারী, মুসলিম। অর্থাৎ শিশুরা প্রকৃতি সম্মত উপায়ে জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে মাতা-পিতা তাদেরকে ইহুদী, নাসারা এবং মজুসি করে তুলেন। এটাও সত্য যে, মাতা-পিতা তাদেরকে মুসলমান ও হিন্দু করে তুলেন। এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, যখন শিশু সাবালক হয়ে ওঠে তখন মাতা-পিতা তাকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে খৃষ্টান করে ফেলেন। বরং মাতা-পিতার আচরণই

শিশুরা অনুসরণ করে এবং তাঁদের কথা শুনেই সেইমত তৈরী হয়। যদি মাতা-পিতা তাদের সৎ উপদেশ না দেন তাহলে অন্যের কর্মপদ্ধতির অনুকরণ করবে। অনেকে বলেন শিশুদের স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া উচিত, পরে বড় হলে আহমদী হয়ে যাবে। আমি মনে করি যদি শিশুদের কানে অন্য কারো আওয়াজ না ঢুকে তাহলে স্বভাবতঃ আহমদী হয়ে যাবে। কিন্তু যখন বাজে আওয়াজগুলি তার কানে এসে পৌঁছায় তখন শিশু সঙ্গে সঙ্গে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর তারা তেমনি তৈরী হবে যেমন দেখবে শুনবে। যদি ফেরেস্তা আপন কথা না শুনায় তাহলে শয়তান তার সঙ্গি হয়ে যাবে। কিংবা যদি তার কানে সৎ বাক্য না পৌঁছায় তাহলে অসৎ বাক্য তার কানে পৌঁছাবে ফলে সে অসৎ হয়ে যাবে।

সুতরাং যদি আপনারা পাপের ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে চান তাহলে যেমন ধূমপান নিষিদ্ধকরণ ক্যাম্প হয় তেমনি ভাবে গড়ে তুলুন এবং পরবর্তী শিশুদের পাপের হাত হতে রক্ষা করুন যাতে ঐসব শিশুরা সুরক্ষিত থাকে।

এবার আমি শিক্ষা প্রসংঙ্গে কিছু বলছি—

(১) শিশুর জন্মের পর সর্বপ্রথম শিক্ষনীয় বিষয় হলো আজান। যার বিশেষত্ব প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। তাদের মল-মূত্র যথাশীঘ্র পরিষ্কার করে দেবেন। হয়তো কেউ কেউ বলবেন এ কাজ তো মেয়েদের। কথা ঠিকই, কিন্তু পুরুষেরা প্রথমে লক্ষ্য রাখলে পরে মেয়েরাও লক্ষ্য রাখবেন। সুতরাং পুরুষদের কর্তব্য মেয়েদেরকে বুঝানো যে শিশু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে তার মধ্যে কোথা হতে ভাল চিন্তাধারা উদয় হবে? কিন্তু দেখা যায় এবিষয়ে কারো কোন ভ্রুক্ষেপ থাকে না।.....যদি

শিশদের বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা না হয় তাহলে অভ্যন্তরীণ উন্নতি কিরূপে সম্ভব ?

কিন্তু যদি শিশুরা বাহ্যিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার প্রভাব অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করবে ফলে তার অভ্যন্তর পবিত্র হয়ে উঠবে। কেননা অপরিষ্কার জনিত কারণে তার মধ্যে যে পাপের সঞ্চার হয় তাতে সে নিষ্কৃতি পাবে। চিকিৎসা শাস্ত্র হতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুকালে অপরিষ্কার জনিত কারণে পাপের সূত্রপাত হয়। যদি শিশুর গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে তাহলে সেই স্থানে চুলকাতে শুরু করে তাতে সে আনন্দ অনুভব করে এবং এইভাবে পরে তার মধ্যে কামুক ভাবের উদয় হয়। যদি শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং যেমন যেমন বয়োপ্রাপ্ত হবে তেমনি তাকে বলতে হবে যে ঐ স্থানকে পরিচ্ছন্নতার জন্য ধৌত করা উচিত তাতে সে ঐ কুপ্রবৃত্তি হতে বেশ কিছু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকতে পারে। এ শিক্ষাও প্রথম হতে শুরু হওয়া আবশ্যক।

(৩) শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ে আহার দেওয়া উচিত। এতে শিশুর মধ্যে ইচ্ছাশক্তিকে দমন রাখার প্রবণতা জন্মে এবং এই প্রকারে বহু অন্যায় কার্য হতে রক্ষা পেতে পারে। চুরি লুট, জবরদস্তি ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের প্রবণতাকে সংযত না করলে ঐ প্রবৃত্তিগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। কেননা এমনিতেই মানুষের মধ্যে প্রবণতাকে প্রশমিত করার শক্তি থাকে না। আর তার কারণ যখনই শিশুরা কান্নাকাটি শুরু করে অমনই মা দুধ পান করান, এটা কিন্তু করা উচিত নয় বরং নির্দিষ্ট সময় দুধ পান করানো উচিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে আহারে অভ্যস্ত করা দরকার। ফলে এইসব গুণগুলি অর্জিত হবে যথা—ক) সময়ানুবর্তিতা খ) ইচ্ছাশক্তির দমন গ) স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার ইচ্ছা

ঘ) মিলিতভাবে কাজ করার অভ্যাস। এ সবে শিশুদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি এবং প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না, কেননা তারা তো সম্মিলিতভাবে তা করে। চ) অপব্যয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হবে না। যে সব শিশু অধিক মাত্রায় খাদ্য সামগ্রী নিতে থাকে তারা তা হতে কিছু নষ্ট করবে, কিছু খাবে। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয় তাহলে তারা তা নষ্ট করবে না। ফলতঃ এইরূপে শিশুদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আহারে তুষ্ট থাকা এবং আত্মসন্তুষ্টির অভ্যাস গড়ে উঠবে। ছ) লোভ সংবরণের অভ্যাস গড়ে উঠবে—যেমন, বাজার দিয়ে চলাকালীন শিশু কোন জিনিস দেখে তা নিতে চায়, যদি সে সময় তাকে তা না দেওয়া হয় তাহলে সে তার ইচ্ছাকে সংযত করবে এবং বড় হওয়ার পর অনেক সময়ে মনের মধ্যে লোভের আকাঙ্খাকে দমন করার প্রবৃত্তি জন্মিবে। এইরূপে ঘরে যদি কোন জিনিস থাকে এবং শিশু তা চায় তাহলে তাকে বলে দেওয়া উচিত যে, খাবার সময় দেওয়া হবে এতেও ঐ শক্তি সঞ্চয় হবে এবং প্রবৃত্তিকে সংযত রাখবে। কৃষকেরা ইক্ষু মূলা গাজর, গুড় ইত্যাদি ব্যাপারেও এইরূপ পন্থা অবলম্বন করতে পারেন।

(৪) শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ তার স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। কিন্তু এ থেকে বেশী উপকারিতা হয় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। তাতে তার সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। নির্দিষ্ট সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করলে নাড়িভূড়ির প্রক্রিয়া ভাল হয়, ফলে নির্দিষ্ট সময়েই মলমূত্রের বেগ আসে। ইউরোপে তো কোন কোন ব্যক্তি মল-মূত্রের বেগের ফলে সময়ও বলে দিতে পারেন যে এখন এই সময় হয়েছে। কেননা নির্দিষ্ট সময়ে তো তাঁর মলমূত্রের বেগ আসে। তাই শিশুদের জন্য ইহা খুবই জরুরী। সময় মত কাজ করার

ফলে শিশুদের মধ্যে নামাজ রোজার অভ্যাস সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠবে এবং জাতীয় কাজ কর্মে পশ্চাদ্‌পসারণ হওয়ার প্রবণতা জন্মিবে না ফলে গর্হিত আনন্দ হতে নিষ্কৃতি পাবে। গর্হিত আনন্দের প্রবণতা জন্মে অনিয়মিত কাজ কর্মের ফলে। সেইরূপ অনিয়মিত আহারে অভ্যস্ত—যেমন, শিশুরা খেলাধূলায় মগ্ন হয়ে আছে এমন সময় মা খাবারের জন্য ডাক দিলেন কিন্তু শিশু এলো না এবং যখন এলো মা তখন বললেন, দাঁড়াও খাবার গরম করি। কিন্তু ঐ সময় শিশুকে ক্ষিদে পেয়েছে তাই যে দৌড়ে এসেছে এবং অযথা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। কারণ ঐ সময় তো সে খাবারের জন্য আসে যখন সে ক্ষিদে সংবরণ করতে পারে না ফলে ভীষণ সোরগোল শুরু করে।

(৫) সেইরূপ খাবারও পরিমিত দেওয়া উচিত। তাতে পরিতৃপ্ত হয়ে খায় এবং লোভ দূরীভূত হয়।

(৬) রকমারী খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন, যেমন মাংস, শাকসব্জী ফল ইত্যাদি। কেননা খাদ্য হতে নানারকম আচার আচরণের উপ্রব হয়। বিভিন্ন ধরণের চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন! তবে শিশুদের মাংস কম পরিমাণে কিন্তু শাক সব্জী বেশী দেওয়া দরকার! কেননা মাংসে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় তাই শেশবস্থায় উত্তেজনা কম হওয়া উচিত।

(৭) যখন শিশু কিছুটা বয়োপ্রাপ্ত হয় তখন খেলাধূলার মত তার নিকট হতে কাজও নিতে হয়। যেমন অমুক পাত্রটি নিয়ে এসো, এই জিনিষটি ওখানে রেখে দাও, এই বস্তুটি অমুককে দিয়ে এসো—এই রকম ধরণের কাজ করানো চাই। হ্যাঁ, তবে কিছু সময়ের জন্য তাকে নিজের মত করে খেলতে দেওয়ারও অনুমতি দেওয়া দরকার।

(৮) শিশুদের আত্মবিশ্বাসে অভ্যস্ত করতে হবে। যেমন কোন জিনিষ সামনেই আছে কিন্তু তাকে বলা হবে এখন নয় পরে দেওয়া হবে। এমন না হয় যেন লুকিয়ে রাখা হয়। কেননা এই আচরণ দেখেই সে সেইরকম করবে। আর তাতে চুরির প্রবৃত্তি এসে যাবে।

(৯) শিশুকে বেশী আদর করা উচিত নয়। অতিরিক্ত চুম্বন বা সোহাগে বহুবিধ অন্যায়ের প্রবণতা শিশুর মধ্যে উদ্ভূত হয়। যে আসরে সে যেতে চায় তাতে তার ইচ্ছা হয় যে, লোকে তাকে ভাল বাসুক। এতে তার চারিত্রিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

(১০) মাতা-পিতার উচিত বিনয়ী হয়ে কাজ হাসিল করা। যেমন শিশু যদি অসুস্থ থাকে এবং তার এমন কোন জিনিষ খাওয়া অনুচিত তাহলে সেই অবস্থায় মাতা-পিতাও খাবেন না বা ঘরে আনবেন না বরং শিশুকে বলা দরকার যে, তুমি খাবে না তাই আমরাও খাব না। এতে শিশুদের মধ্যে বিনয় ভাবের উদ্রেক হয়।

(১১) শিশুদের অসুস্থাবস্থায় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা ভীতি, স্বার্থপরতা, ক্রোধান্বিত হওয়া এই সবরকমের কুঅভ্যাস দীর্ঘকাল রোগ ভোগের ফলে উৎপন্ন হয়। কোন কোন ব্যক্তির এমনও অবস্থা হয় যে, অন্য ব্যক্তিদের ডেকে ডেকে নিকটে বসায়। কিন্তু কাউকে এমনও দেখা যায় যে, তার পাশ দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে বলেঃ দেখতে পাও না, অন্ধ হয়ে গিয়েছ—এও দীর্ঘকাল রোগ ভোগের ফল। যেহেতু রোগীকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এই জন্য সে আরাম পাওয়া কামনা করে।

(১২) শিশুদের ভীতিপ্রদ কাহিনী শুনানো উচিত নয়।

এতে তাদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হবে। আর এইসব শিশু বড় হয়ে বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবে না। যদি শিশুর মধ্যে ভয়ের কিছু সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে বীরত্ব বিষয়ক গল্প শুনানো উচিত। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সাহসী ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে দেওয়া উচিত।

(১৩) শিশুদের নিজেদের মনোমত বন্ধু নির্বাচন করতে দেওয়া উচিত নয় বরং মাতা-পিতারই নির্বাচন করে দেওয়া শ্রেয়। তবে নির্বাচন ক্ষেত্রে চরিত্রবান ছেলে হওয়া দরকার। এতে মাতা-পিতার এটাও লাভ হবে যে কারা কারা ভালো ছেলে তা জানার। ফলে একে অন্যের সঙ্গে সহযোগী হবে। কেননা যখন মাতা-পিতা নিজেই শিশুদের নির্দেশ দিবেন যে, অমুক শিশুর সঙ্গে খেলা কর তখন এইভাবে শিশুদের চরিত্রের তদারকিও হবে।

(১৪) শিশুদের বয়স অনুপাতে কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা দরকার। যাতে তারা নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়। একটি গল্প প্রচলিত আছে : এক ব্যক্তি দুটি ছেলে ছিল। তিনি তাদের ডেকে একজনের হাতে আপেল দিলেন এবং বললেন বন্টন করে খাও। ছেলেটি আপেল নিয়ে চলতে লাগলো তখন তার পিতা বললেন : জানো কিরূপে বন্টন করবে? ছেলেটি বললো : জানিনা। উত্তরে পিতা বললেন—যে বন্টন করে সে কম অংশ নেয় এবং অন্যকে বেশী অংশ দেয়। তা শুনে ছেলেটি বলল : তবে অন্যকে দাও সেই বন্টন করুক। এতে অনুমান হয় প্রথম থেকে ছেলেটির মধ্যে কু-অভ্যাস বর্তমান ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও জানা যায় যে, এ ব্যাপার সম্পর্কে ছেলেটি সচেতন ছিল যে, দায়িত্ব অর্পিত হলে অন্যকে প্রাধান্য দিতে হয়। এই মনোভাব জাগরিত হওয়ার জন্য কিছু কিছু খেলাধুলা অত্যন্ত উপকারী। যেমন—ফুটবল ইত্যাদি।

কিন্তু খেলাধুলার মধ্যেও লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে কোন কু-অভ্যাস শিশুদের মধ্যে প্রবেশ না করে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মাতা-পিতা স্নেহবশে আপন সন্তানদের সমর্থন করেন এবং অন্যের সন্তানদের আপন সন্তানদের কথাবার্তা মানতে বাধ্য করেন। এর ফলে শিশুদের মধ্যে আপন কথাবার্তা শুনানোর জন্য জিদ উৎপন্ন হয়।

(১৫) শিশুদের মনে এই ধারণা জন্মাতে হবে যে, সে মহৎ এবং ভাল। রসুল করীম (সাঃ) কত সুন্দরভাবে সামান্য কথায় তা ব্যক্ত করেছেন ঃ শিশুদের গালি দিও না। কেননা গালি দিলে ফেরেস্তারা বলে—তাই হোক ; আর তাই হয়ে যায়। এ কথার অর্থ হচ্ছে ফেরেস্তারা আচরণেরই ফল নির্ণয় করে থাকে। যখন শিশুদের বলা হয় যে, তুমি খারাপ তখন সে নিজ চিন্তাধারায় তাই স্থান করে নেয়। আর আমি খারাপ এই মনোভাবে সে সেই-রূপই হয়ে যায়। সেইজন্য শিশুদের কটুকথা না বলা উচিত বরং সুন্দর আচার ব্যবহার প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের সুনাম করতে হবে।.....আমার মেয়ে পয়সা চাইতে এলো। আমি যখন পয়সা দিলাম তখন সে বাঁ হাত বাড়ালো। আমি বললাম ঃ এতো ঠিক নয়। সে বলল ঃ ভুল হয়ে গিয়েছে। আর এরূপ করবো না। এইরূপে তার ভুল ধরিয়ে দিলে এটা তার বোধে এসে যাবে।

(১৬) শিশুদের মধ্যে যাতে জিদের অভ্যাস গড়ে না ওঠে তার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি শিশু কোন কথায় জিদ ধরে বসে তাহলে তার সমাধান হলো—অন্য কোন কাজে তাকে লিপ্ত করে দেওয়া এবং জিদ করার কারণ উপলব্ধি করে তা দূর করা।

(১৭) শিশুদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। শিশুরা স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয় হয়। যদি আপনি তাকে তুই বলে সম্বোধন করেন তাহলে সে ও তুই বলবে।

(১৮) শিশুদের সম্মুখে মিথ্যা বলা অহংকার দেখান এবং বদমেজাজি হওয়া উচিৎ নয়। কেননা তারাও সেই অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। সচারাচর দেখতে পাওয়া যায় মাতা-পিতাই শিশুদের মিথ্যা বলতে শিখায়। মা শিশুর সামনে হয়তো কোন কাজ করে কিন্তু পিতা জিজ্ঞাসা করলে বলে—সে তা করে নাই। এতে শিশুরও মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে ওঠে। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মাতা-পিতা ছেলের অনুপস্থিতিতে ঐরূপ করবে। বরং উদ্দেশ্য হলো—যদি সর্বক্ষণ ঐ বদভ্যাস থেকে বাঁচতে না পারেন তাহলে অন্ততঃ শিশুদের সামনে ঐরূপ না করাই উত্তম। যাতে এই অসুখ ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত না হয়।

(১৯) শিশুদের সর্বপ্রকার নেশা হতে রক্ষা করতে হবে। নেশায় শিশুর স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার জন্য মিথ্যা বলার প্রবণতা দেখা যায় এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আবোল-তাবোল বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এক ব্যক্তি হজরত খলিফাতুল মসীহ ১ম (রাঃ) এর আত্মীয় ছিলেন। তিনি একটি ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বললেন ঃ একে আমি নিজের মত করে গড়ে তুলবো। ঐ ব্যক্তিটি মাদক দ্রব্য সেবন করতেন এবং ধর্ম-কর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতেন না। হজরত খলিফাতুল মসীহ ১ম (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন ঃ তুমি তো খারাপ হয়েই গিয়েছ আবার এই ছেলেটিকে কেন খারাপ করছো? কিন্তু ব্যক্তিটি নাছোড় বান্দা কোন সুযোগে খলিফাতুল মসীহ ১ম (রাঃ) ছেলেটিকে নিজের কাছে ডেকে তাকে বুঝালেন যে, তোমার বিচার বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে যে ঐ লোকটির সঙ্গে ঘোরাফেরা করছো? বরং কোন কাজ শিখ। তাঁর বুঝানোতে ছেলেটি ঐ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করলো। কিন্তু কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তিটি অপর একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে

হজরত খলিফাতুল মসিহ ১ম (রাঃ)কে বললেন ঃ একে এবার খারাপ করুন তো দেখি। তাঁর নিকট খারাপ করার অর্থ এটাই ছিল যে, তাঁর গণ্ডি হতে ছেলেটিকে মুক্ত করা। হজরত খলিফাতুল মসীহ ১ম (রাঃ) ছেলেটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে বললেন ঃ আমার নিকট হতে টাকা-কড়ি নিয়ে কোন কাজ কর। কিন্তু ছেলেটি তা মানলো না। অবশেষে তিনি ঐ ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি ছেলেটিকে কি করেছো ? ব্যক্তিটি বললেন ঃ আমি ওকে মাদক দ্রব্য সেবন করাই আর তার জন্যই ওর সাহস হয় না আমার সংস্পর্শ ত্যাগ করার। মোট কথা নেশাতে উন্নতির মার্গ বন্ধ হয়ে যায়।

মিথ্যা সবচেয়ে অনিষ্টকর ব্যাধি। শিশুর জন্মলগ্ন হতে এই ব্যাধি হতে শিশুকে অতি সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা দরকার। এমন কিছু পরিস্থিতির কারণে এই ব্যাধি আপনা আপনি শিশুদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। যেমন কোন কোন শিশুর বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ম হয়। সে কোন কিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার সত্যতা নিজে থেকেই নিরূপণ করে নেয়। আমার বোন শৈশবে প্রত্যহ আমাকে একটি করে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনাতো। আমি তো অবাক হতাম যে কিভাবে সে প্রত্যহ রাত্রে স্বপ্ন দেখে। শেষে জানতে পারলাম যে, শয়নকালে সে যা চিন্তা ভাবনা করতো সেটাকেই স্বপ্ন বলে মনে করতো। তাই শিশুরা যা কিছু শুনে তাই কল্পনা করতে থাকে ফলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে মিথ্যা বলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যায়। সেই জন্য শিশুদের বুঝানো উচিত যে, কল্পনা এক জিনিষ আর বাস্তব অন্য জিনিষ। যদি কাল্পনিক তত্ত্ব শিশুদের সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করানো হয় তাহলে শিশুরা মিথ্যার হাত হতে রক্ষা পেতে পারে।

(২০) শিশুদের পৃথকভাবে খেলাধূলা করতে নিষেধ করা উচিত।

(২১) উলঙ্গ থাকতে নিষেধ করতে হবে।

(২২) শিশুদের এই মানসিকতায় তৈরী করতে হবে যে সে যেন নিজের ভুল স্বীকার করে। আর তার নিয়ম হলো—ক) তাদের সামনে নিজের অপরাধ গোপন না করা। খ) যদি শিশুদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে তার সঙ্গে এমন সহমর্মিতার ব্যবহার করুন যাতে সে লজ্জিত হয়ে বুঝতে পারে যে, তার দ্বারা এমন কোন বিরাট ক্ষতি হয়ে গিয়েছে যার জন্য তার উপর সহানুভূতি দেখাচ্ছে এবং শিশুকে বুঝানো উচিত যে, এই ভুলের জন্য এমন ক্ষতি হয়েছে। গ) ভবিষ্যতে ভুল-ত্রুটির হাত হতে রক্ষা করতে শিশুদের সঙ্গে এমনভাবে আলাপ আলোচনা করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে তাদের ভুলের জন্য মাতা-পিতাকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যেমন—শিশুদের দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হলে তাদের সামনে তার ক্ষতি পূরণ প্রদান করা। তাতে শিশুদের মনে এই ধারণা জন্মিবে যে ক্ষতির ফল ভাল হয় না। প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত খারাপ ধারণা। আমার মতে শিশুদের এইভাবে সুশিক্ষা দান করা অতি আবশ্যক। ঘ) শিশুদের পৃথকভাবে গোপনে তিরস্কার করা উচিত।

(২৩) শিশুদের কিছু পরিমাণ ধনের অধিকারী করা দরকার। এতদ্বারা শিশুদের নিম্নবর্ণিত স্বভাবগুলি উৎপন্ন হয়। যথা— ক) দান করার প্রবণতা খ) মিতব্যয়িতা গ) আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করা। মনে করুন শিশুর নিকট তিন পয়সা আছে। তাকে বলতে হবে এক পয়সায় কোন কিছু নিয়ে এসো এবং অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে খাও। এক পয়সায় কোন খেলনা ক্রয় করে নাও আর এক পয়সা দান কর।

(২৪) এইরূপ শিশুদের জিনিষও সকলের জন্য দরকার। যেমন কোন একটি খেলনা দেওয়া হলে বলতে হবে এটি তোমাদের

সকলের। এটিকে নিয়ে সকলেই খেলা কর যেন কেউ সেটিকে নষ্ট না করে। এইভাবে জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

(২৫) শিশুদের শিষ্টাচার ও ভদ্র আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে হবে।

(২৬) শিশুদের শরীর চর্চার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং তাদের উদ্যমশীল করে গড়ে তোলার প্রবৃত্তি থাকা দরকার। কেননা এ সবই পার্থিব উন্নতি ও আত্মশুদ্ধি উভয় দিক মঙ্গলজনক।

(মিন্ হাজুত তা-লেবিন্ পৃঃ ৫২-৬১ লেকচার ১৯২৫)

—০—

For Further Information
Please Contact

Ahmadiyya Muslim Jamaat
The London Mosque
16, Gressenhall Road
SW18 5QL London

Ahmadiyya Muslim Jamaat
Qadian. Punjab, India

Ahmadiyya Muslim Jamaat
205, New Park Street
Calcutta-700017, INDIA

প্রকাশনায়--আহমদীয়া মুস্লিম জামাত, ২০৫ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট কলি-১৭
মুদ্রণে—আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ২০৫, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, কলি-১৭
ফোন ঃ ৪০০৭১৭
সহযোগিতায়—মজলিস আনসারুল্লাহ, কলিকাতা